পাট, কেনাফ, মেস্তা ফসলের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ কলাকৌশলবিষয়ক কৃষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭

রচনা ও সংকলনে

ড. মোঃ নাসির উদ্দিন, পিএসও
জেনেটিক রিসোর্সেস এন্ড সীড বিভাগ

ড. মোঃ শাহীন পলান, এসএসও
পেস্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ

মোঃ ইউনুস আলী, এসএসও
ফাইবার কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট বিভাগ

মিসেস মণিকা রাণী দেবনাথ, এসএসও
কৃষিতত্ত্ব বিভাগ

এবং

ড. মোঃ সামিউল হক, সিএসও
ফাইবার কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট বিভাগ
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট।

সম্পাদনায়

জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিএসও
জেনেটিক রিসোর্সেস এন্ড সীড বিভাগ

এবং

ড. মোঃ মুজিবুর রহমান
পরিচালক (কৃষি), চলতি দায়িত্ব
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট।

সূচিপত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১।	ভূমিকা	৪
০২।	নাবী মৌসুমে সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতিতে বীজ উৎপাদন	৫
	উপযোগী জমি নির্বাচন ও তৈরী	৫
	বীজ বপনের সময়, বীজের হার ও সার প্রয়োগ	৬
	আন্তপরিচর্যা ও অবাঞ্ছিত গাছ তুলে ফেলা	৭
০৩।	কান্ড ও ডগা রোপন পদ্ধতি	৭
	ডগা রোপনের জন্য জমি নির্বাচন ও তৈরী, কাটিং প্লটে সার প্রয়োগ	৮
	ডগা রোপন সময়, ডগা রোপন পদ্ধতি ও আন্তঃপরিচর্যা	৮
০৪।	চারা রোপন পদ্ধতি	৯
	সার প্রয়োগ ও বীজ ফসলের পরিচর্যা	৯
০৫।	পাট, কেনাফ ও মেস্তার প্রধান প্রধান রোগ বালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা	১০
	চারা মড়ক ও কান্ড পচা রোগ এবং তাদের দমন ব্যবস্থাপনা	১০
	শুকনা ক্ষত রোগ ও কাল পট্টি রোগ এবং তাদের দমন ব্যবস্থাপনা	১১
	আগা শুকিয়ে যাওয়া, ঢলে পড়া এবং নরম পচা রোগ ও তাদের দমন ব্যবস্থাপনা	১২
	পাতার হলদে ছিট পড়া বা মোজাইক রোগ, শিকড় গিট রোগ এবং তাদের দমন ব্যবস্থাপনা	১৩
০৬।	পাট, কেনাফ ও মেস্তার প্রধান প্রধান পোকামাকড় এবং দমন ব্যবস্থাপনা	১৪
	উড়চুঙ্গা, বিছা পোকা বা শুয়ো পোকা এবং তাদের দমন ব্যবস্থাপনা	১৪
	ঘোড়া পোকা এবং তার দমন ব্যবস্থাপনা	১৫
	চেলে পোকা, হলুদ মাকড় এবং তাদের দমন ব্যবস্থাপনা	১৬
	ছাতরা পোকা এবং তার দমন ব্যবস্থাপনা	১৭
	কেনাফ স্পাইরাল বোরার এবং তার দমন ব্যবস্থাপনা	১৮
০৭।	পাট ও পাট জাতীয় বীজ ফসলের জমির জন্য উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থা	১৯
০৮।	পাট ও পাট জাতীয় বীজ ফসল কর্তন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি	২০
	বীজ ফসল কর্তন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	২০
	সংরক্ষণ পদ্ধতি ও বীজের ফলন	২১
০৯।	পাট ও পাট জাতীয় বীজ ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস ও তার গুরুত্ব	২২
১০।	শীতকালীন শাকসব্জির সাথে পাট জাতীয় বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি	২৩
	প্রযুক্তির উপযোগিতা ও মাঠ পর্যায়ে করণীয়	২৩
	প্রযুক্তি হতে প্রাপ্ত ফলন	২৪
১১।	কৃষি বনায়ন পরিবেশে নাবী পাট ও পাট জাতীয় বীজ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি	২৫
	বাস্তবায়ন কৌশল, নাবী পাট ও পাট জাতীয় বীজ উৎপাদন পদ্ধতি	২৫
	(ক) জমি নির্বাচন, (খ) জমি তৈরী ও (গ) বীজ বপনের সময়	২৫
	(ঘ) বীজের হার, (ঙ) সার প্রয়োগ, (চ) আন্তঃপরিচর্যা ও (ছ) রোগ ও পোকামাকড় দপন	২৬
	(জ) বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষা ও (ঝ) ফলন	২৭

পাট, কেনাফ, মেস্তা ফসলের বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ কলাকৌশল

ভূমিকাঃ

পাট বাংলাদেশের প্রধান ও গুরুত্বপুর্ণ অর্থকরী ফসল। ধানের পরেই পাট বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখনও পর্যন্ত একক ফসল হিসেবে পাট ও পাট জাতীয় পণ্য হতে প্রায় ৪% রপ্তানী আয় হয়ে থাকে। পাট উৎপাদনে আবাদী জমির পরিমান কখন ও বৃদ্ধি পায় আবার কখন ও হ্রাস পায়। তবে পাটের গড় ফলন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ১৯৭০-'৮০ দশকে ১৫-১৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাটের চাষ হতো যা বর্তমানে কমে ৬-৭ লক্ষ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। আশির দশকে দেশী পাটের (*Corchorus capsularis*) আবাদ বেশী হতো এবং তোষা পাটের (*Corchorus olitorius*) আবাদ কম হতো। বর্তমানে দেশে দেশী ও তোষা পাট ছাড়াও কেনাফের (*Hibiscus cannabinus*) আবাদ হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন সুবিধার কারণে কেনাফ চাষের এলাকা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রধানত তোষা পাটের চাষ হয় এবং সেই তোষা পাটের বীজ আমাদের দেশে প্রবেশের ফলে বপন মৌসুমে তোষা পাট বীজের সহজলভ্যতা ছাড়াও সময়োপযোগী ও প্রচলিত শস্য বিন্যাসের সাথে মানানসই আগাম বপনযোগ্য তোষা পাটের জাত উদ্ভাবন করার ফলে দেশে দেশী ও তোষা পাট চাষের হার ৭০:৩০ এর স্থলে দেশি, তোষা ও কেনাফের আবাদ যথাক্রমে ৫:৮৮:৭ এ পৌঁছেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমান জমিতে পাট ও কেনাফের আবাদ হয় তার জন্য গড়ে প্রতি বৎসর ৫৫০০-৬০০০ মেট্রিক টন বীজের প্রয়োজন হয়। এর প্রায় ২৫০-৩০০ মে. টন দেশী পাট বীজ দরকার হয় যার পুরোটাই দেশে উৎপাদিত হয়। অন্যদিকে তোষা ও কেনাফ বীজের অল্প পরিমান দেশে উৎপাদন হয় এবং সিংহভাগই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত হতে আমদানী করা হয়। প্রতি বৎসর যে পরিমান তোষা ও কেনাফ বীজ আমদানি করা হয় তাতে ৪০-৫০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। অথচ আমাদের দেশের জলবায়ু এবং জমি দুটোই পাট বীজ উৎপাদনের যথেষ্ট উপযোগী। শুধুমাত্র কৃষকগণকে আগ্রহী করে তোলা এবং যথাযথ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ বিপুল পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পাট বীজ উৎপাদনের বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে যা এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কৃষকদের পাট বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি দেশে পাট বীজ উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে সহায়ক হবে।

কৃষকগণ সাধারণতঃ তার পাট আঁশ ফসলের জমির এক পার্শ্বে কিছু অংশনা কেটে বীজ ফসলের জন্য রেখে তা থেকে উৎপাদিত বীজ পরবর্তী বছর সে নিজে আঁশ ফসল উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করে এবং অতিরিক্ত বীজ বাজারে বা অন্য কৃষকের নিকট বিক্রি করে। এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত বীজের ফসল বহুদিন (প্রায় ৯ মাস) মাঠে থাকে, ফলে ঝড়, বৃষ্টি, শীত, পোকা-মাকড় ও নানাবিধ প্রতিকূলতায় বীজের গুনগত মান ও ফলন দুটোই খুবই কম হয়। তা ছাড়া বিশেষ করে তোষা পাট গাছের আগায় খুব অল্প পরিমান ফল ধারণ করে। আঁশ ফসলের জন্য বপনকৃত জমি থেকে বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রেঐ সব জমিতে পাট গাছ বড় হওয়ার পর প্রধান করণীয় হচ্ছে বিজাত এবং রোগাক্রান্ত গাছ বাছাই করে তুলে ফেলা। এছাড়া ঝড় ঝাপটা থেকে গাছগুলিকে রক্ষা এবং হেলে পরা রোধ করার জন্য বেশ কটি করে গাছের আগা একত্রে বেঁধে দিতে হবে। পাট বীজ ফসলের জমিতে অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো আগাছা দমন, ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ এবং রোগ ও পোকা-মাকড় দমন করা। প্রকৃত পক্ষে একই জমি থেকে

অধিক পরিমান মান সম্পন্ন বীজ পাওয়ার জন্য আঁশ এবং বীজ ফসল গবেষণার মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) উদ্ভাবিত উন্নত পদ্ধতিতে পাট ও পাট জাতীয় বীজের উৎপাদন কলা কৌশল বীজের মান ও ফলনের স্বার্থে এক বিরাট অবদান রেখেছে।

বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নাবী পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি একটি আধুনিক পদ্ধতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সাধারণভাবে নিচের তিনটি পদ্ধতিতে পাট বীজ উৎপাদন করা যায়। পদ্ধতিগুলো হচ্ছেঃ

১. নাবী মৌসুমে সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতি
২. গাছের কান্ড বা ডগা রোপন পদ্ধতি এবং
৩. চারা রোপন পদ্ধতি।

পাট বীজ উৎপাদনের জন্য তিনটি পদ্ধতিই ব্যবহার করা যায়। তবে সার্বিক কৃষি ব্যবস্থাপনা ও কৃষকের অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনা করলে সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতিটিই সবচেয়ে সহজ এবং লাভজনক। তাছাড়া অন্য পদ্ধতি দুটো বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহারযোগ্য।

নাবী মৌসুমে সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতিতে বীজ উৎপাদন

নাবী শব্দের অর্থ দেরীতে শুরু করা অর্থাৎ দেরীতে বীজ বপন করে, পাট গাছের দৈহিকবৃদ্ধির সময় কমিয়ে, জনন পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহের ব্যবস্থা করা। প্রকৃত পক্ষে পাট গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য লম্বাদিন এবং ফুল-ফল ধারনের জন্য খাট দিন দৈর্ঘ্য প্রয়োজন। যে কারণে আঁশ ফসলের জন্য লম্বাদিন অর্থাৎ ফাল্গুণ-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) মাসে বীজ বপন করে আষাঢ়-শ্রাবণ (জুলাই-আগস্ট) মাসে পাট কাটা হয়। কিন্তু বীজের জন্য খাটদিনের প্রয়োজন হয়বলে ভাদ্র-আশ্বিন (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে বীজ বপন করে অগ্রহায়ন-পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারী) মাসে বীজ ফসল সংগ্রহ করা হয়। এ পদ্ধতিতে পাট গাছ লম্বায় (২-৪ ফুট) কম হলেও অধিক সংখ্যক ডালপালাসহ সুপুষ্ট ফল ধারণ করে, যা থেকে অধিক পরিমাণ ও গুণগতভাবে উন্নত মানেরবীজ পাওয়া যায়।

চিত্র: সারিতে পাট বীজ বপন

উপযোগী জমি নির্বাচন ও তৈরীঃ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নাবী পদ্ধতিতে বীজ বপনের সময় হলো শ্রাবণ-ভাদ্র মাস। সে কারণেই মোটামুটি উঁচু জমি, যেখানে বৃষ্টি বা বন্যার পানি জমে না অথবা দ্রুত নিষ্কাশনযোগ্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। মাটি দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ প্রকৃতির হওয়া ভাল। লক্ষ্য রাখতে হবে, মাটিতে যেন পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব সার ও ফসল উঠা পর্যন্ত রস থাকে। জো বুঝে জমি তৈরী করতে হবে। চাষের সময় আগাছা ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে। জমি তৈরীর সময় আগাছা পরিস্কার না করলে জমিতে আগাছার

পরিমান বেশী হয় এবং নিড়ানী খরচ বেশী পড়ে, সেইসাথে নিড়ানী দিতে দেরী হলে ফসলের বেশ ক্ষতি হয় এবং বীজের ফলনে তার প্রভাব পড়ে।

বীজ বপনের সময়ঃ

পাটের বীজ শ্রাবণ মাসের ৩য় সপ্তাহ থেকে ভাদ্রের ১৫ (আগষ্ট) তারিখ পর্যন্ত বপন করা চলে। তবে, দেশী পাট বীজ শ্রাবণ (মধ্য জুলাই-মধ্য আগষ্ট) মাসের মধ্যে এবং তোষা পাটের বীজ ১৫ ভাদ্রের (৩০ শে আগষ্ট) মধ্যে বপন করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। কারণ এ সময় দিনের দৈর্ঘ্য খুব খাট না থাকায় গাছ বেশ দৈহিক বৃদ্ধির সুযোগ পায়। দেশের অঞ্চল বিশেষে বপন সময়ের পার্থক্য ঘটে, যেমন উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে (রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও বগুড়া) উল্লেখিত সময়ের ১৫ দিন আগে বীজ বপন করতে হবে কেননা শীত ঐ অঞ্চলে আগে আসে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে যথা-যশোর, কুষ্টিয়া অঞ্চলে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।

বীজের হারঃ

ফসলের প্রকার	বপন পদ্ধতি	কেজি/হেক্টর	গ্রাম/শতাংশ
দেশী পাট	সারিতে বপন	৫.০০	২০.০০
	ছিটিয়ে বপন	৬.০০	২৪.০০
তোষা পাট	সারিতে বপন	৪.০০	১৬.০০
	ছিটিয়ে বপন	৫.০০	২০.০০
কেনাফ, মেস্তা	সারিতে বপন	১০.০০	৪০.০০
	ছিটিয়ে বপন	১২.০০	৪৮.০০

সার প্রয়োগঃ

তোষা জাতের পাট বীজ উৎপাদনের জন্য জমি তৈরীর শেষ চাষে প্রতি শতাংশে ইউরিয়া-৩৩০ গ্রাম, টিএসপি ৪০০-৫০০ গ্রাম, এমপি ২৫০-৩০০ গ্রাম এবং জিপসাম ৩০০-৪০০ গ্রাম সার প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে দস্তা (জিংক) এবং বোরণের অভাব থাকলে শেষ চাষে অন্যান্য সারের সাথে প্রতি শতাংশে ৪০গ্রাম জিংক সালফেট এবং ৫০ গ্রাম বোরিক এসিড প্রয়োগ করতে হবে। বপনের ২০-২৫ দিন এবং ৪০-৪৫ দিন পর (ফুল আসার পূর্বে) প্রতি শতাংশে ২৭০ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।দেশী জাতের ক্ষেত্রে জমি তৈরীর শেষ চাষে প্রতি শতাংশে ২৪০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০০ গ্রাম টিএসপি, ১৫০ গ্রাম এমওপি,২০০-৪০০ গ্রাম জিপসাম প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে যদি দস্তা (জিংক) এবং বোরণের ঘাটতি থাকে তাহলে প্রতিশতাংশে ৪০ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ৫০ গ্রাম বোরিক এসিড প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া বপনের ৩০-৩৫ দিন এবং ৬০-৭০ দিন পর প্রতি শতাংশে ২৪০ গ্রাম ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মাটিতে রস থাকে এবং প্রয়োগকৃত সার গাছের কচি পাতা বা ডগায় নালেগে থাকে। এজন্য উপরি প্রয়োগের ইউরিয়া সার কিছু শুকনা মাটি বা ছাইয়ের সাথে মিশিয়ে বা বিকালে যখন গাছ শুকনা থাকে তখন প্রয়োগ করা ভাল।

নোটঃ যেহেতু আমাদের দেশে কৃষকগণ অল্প পরিমান জমিতে পাট বীজ উৎপাদন করে থাকেন তাই সারের হিসাব শতাংশে দেয়া হলো।

আন্তঃপরিচর্যাঃ

জমিতে রস কম থাকালেআঁচড়া বা নিড়ি দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমির মাটি বসে অর্থাৎ জমাট বেঁধে না যায়। জমির উপরিভাগের মাটি ঝুরঝুরে করে দিলে মাটিতে দীর্ঘদিন রস জমা থাকে এবং ফসল কাটা পর্যন্ত রসের সাধারণত অভাব হয়না। এতে গাছের বৃদ্ধিও স্বাভাবিক হয়। দ্বিতীয় কিস্তির সার প্রয়োগের ২/১ দিন পূর্বে আর এক দফা নিড়ি দিয়ে আগাছা পরিস্কার করতে হবে। শেষ বা তৃতীয় কিস্তির সার প্রয়োগের পূর্বে আর এক দফা নিড়ি দিয়ে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

অবাঞ্চিত গাছ তুলে ফেলাঃ

অবাঞ্চিত গাছ বাছাই হচ্ছে রোগবালাইযুক্ত বা অন্য জাতের বা অন্য কোন কারণে সন্দেহযুক্ত গাছসহ অতিরিক্ত গাছবীজ ফসলের জমি থেকে তুলে ফেলা। চারা অবস্থা থেকে ফসল কাটার পূর্ব পর্যন্ত জমিতে যখনই কোন রোগাক্রান্ত বা সন্দেহযুক্ত গাছ চোখে পড়বে তখনই সেগুলো তুলে ফেলে দিতে হবে। এভাবে গাছ তুলে ফেলার ফলে ফসলের কোন ক্ষতি হয় না বরং বীজের মান উন্নত হয়।

কান্ড ও ডগা রোপন পদ্ধতি

কৃষকের হাতে নাবীতে বপনের জন্য যখন কোন বীজ না থাকে বা যে বছর বৃষ্টিপাতের পরিমান ধারাবাহিকভাবে অধিক হতে থাকে সে বছরগুলোতে আঁশ ফসল থেকে বেছে কান্ড ও ডগা কেটে নিয়ে রোপন করে বীজ উৎপাদন করা যায়। কেননা বৃষ্টির দিনেও কান্ড ও ডগা কেটে রোপন করা যায়, কেবল জমিতে পানি না দাঁড়ালেই চলে।

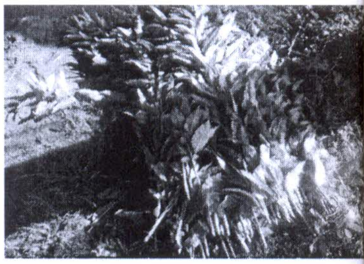

চিত্রঃ পাট গাছ থেকে সংগৃহিত ডগা

আঁশ ফসলের জন্য নির্ধারিত সময়ে বীজ বপন করে গাছের বয়স ১০০-১২০ দিনের মত হলে ঐ জমির গাছের মধ্য থেকে সুস্থ্য সবল গাছ বেছে নিতে হবে। বাছাই করা গাছের ডগা ও কান্ডগুলো ধারালো চাকু, ব্লেড বা বটির সাহায্যে তেরছা করে এমনভাবে কাটতে হবে যাতে প্রতিটি ডগা বা কান্ডের টুকরার দৈর্ঘ্য ১২-১৫ সেন্টিমিটার হয় এবং প্রতি খন্ডে কমপক্ষে ২-৩টি পর্ব বা গিটথাকে।

চিত্রঃ কাটিংস প্রস্তুতকরণ

কাটার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কাটা মাথা থেতলে বা বাকল ফেটে না যায়। থেতলানো বা বাকল ফাটা অংশ মাটিতে পুতলে সেখানে সহজেই পচন ধরে এবং শিকড় সহজে গজায় না। কান্ড বা ডগা রোপনের পর তা মরে যাওয়ার এটি একটি বড় কারণ। কান্ড বা ডগা কাটার পূর্বে বড় বড় পাতা সাবধানে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে যেন পাতার গোড়ার সঙ্গে বাকল ছুটে না আসে। কান্ড বা ডগা রোপনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন কাটা ডগার নীচের অংশ মাটিতে পোতা হয় এর বিপরীত হলে তা মরে যাবে।

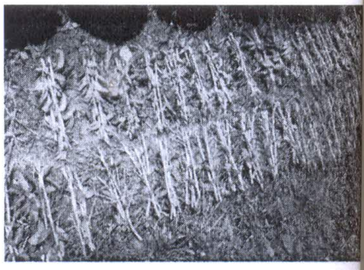

চিত্রঃ প্রস্তুতকৃত কাটিংস

ডগা রোপনের জন্য জমি নির্বাচন ও তৈরীঃ

অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি, যেখানে বন্যার পানি উঠে না বা ঘন ঘন বৃষ্টি হলেও পানি দাঁড়ায়না, সে ধরণের জমি নির্বাচন করা ভাল। মাটির প্রকৃতি বেলে দো-আঁশ হলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। জমির জো অনুযায়ী চাষ ও মই দিয়ে হালকা ভাবে জমি তৈরী করা উচিত। কান্ড রোপনের জন্য বীজ বপন করার মত জমির মাটি মিহি ও সমান করার প্রয়োজন নেই। ডগা রোপনের সময় জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকতে হবে। কাটিং লাগানোর পর জমির রস শুকিয়ে গেলে হালকা সেচ দিতে হবে।

কাটিং প্লটে সার প্রয়োগঃ

শেষ চাষের সময় প্রতি শতাংশ জমিতে ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১২০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে জিপসাম ও জিংকের অভাব থাকলে প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম জিপসাম এবং ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ৫০ গ্রাম বোরিক এসিড প্রয়োগ করতে হবে। রোপন করা ডগার বয়স ২০-২৫ দিন এবং ৪০-৪৫ দিন হলেনিড়ানী দেয়ার পর উপরি প্রয়োগ হিসাবে প্রতি শতাংশ জমিতে ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া সার দুই বার প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগের সার শুকনা ঝুরঝুরে মাটি অথবা ছাইয়ের সংগে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ডগা রোপন সময়ঃ

মধ্য আষাঢ় থেকে শ্রাবণ মাসের মধ্যে ডগা রোপন করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। ডগা কাটার আগেই জমি তৈরী করে নিতে হবে যাতে কাটা ডগাএকদিনও ফেলে রাখতে না হয়। মেঘলা দিনে অথবা বিকালের পড়ন্ত রোদে কান্ড ও ডগা রোপন করা উত্তম। যদি কোন ক্ষেত্রে একস্থানের গাছ কেটে বেশ কিছু দুরের জমিতে ডগা বা কান্ড রোপন করতে হয় সে ক্ষেত্রে টুকরা না করে বালতিতে কিছু পানি নিয়ে কাটা অংশ ডুবিয়ে রেখে দিতে হবে। রোপন সময়ে ডগা টুকরা করে লাগালে চলবে। কাটা কান্ড টুকরা করার পূর্বে বড় বড় পাতাগুলো এক এক করে ছিঁড়ে ফেলে দিতে হবে।

ডগা রোপন পদ্ধতিঃ

উত্তর-দক্ষিণ সারি করে কান্ড ও ডগা রোপন করতে হবে। সারি থেকে সারির দুরত্ব ৪০ সেন্টিমিটার এবং ডগা থেকে ডগার দুরত্ব ১২-১৫ সেন্টিমিটার রাখতে হবে। প্রতিটি কান্ড বা ডগা প্রায় ৬ সেন্টিমিটার গভীর এবং কিছুটা উত্তর দিকে কাত করে (৪৫°কোণ) মাটিতে পুতে দিতে হবে। মাটিতে পুতার দক্ষতা, মাটির উর্বরতা, মাটিতে অবস্থিত রস(পানির পরিমান) ইত্যাদির উপর কান্ড ও ডগার বাঁচা-মরা নির্ভর করে।

চিত্রঃ কাটিংস রোপন

আন্তঃপরিচর্যাঃ

প্লটের মাটি শক্ত থাকলেনিড়ি দিয়ে মাটি ঝর ঝরে রাখতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে নিড়ির ফলে যেন কাটিং-এর গোড়াগুলো নড়ে না যায়। দ্বিতীয় কিস্তির সার প্রয়োগের ২/১ দিন পূর্বে নিড়ানী দিয়ে জমির আগাছা পরিস্কার করতে হবে।অবাঞ্চিত গাছ বাছাই, পোকা-মাকড় দমন, ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এ কাজগুলো সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতিতে যেভাবে করা হয় সেভাবেই করতে হবে।

চারা রোপন পদ্ধতি

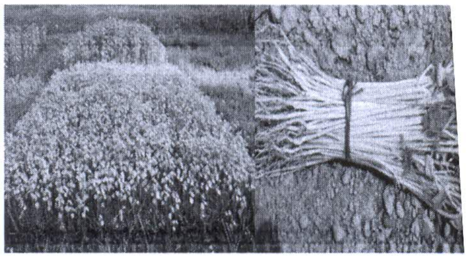

চিত্রঃ পাটের বীজতলা ও রোপনের জন্য চারা

চারা রোপন পদ্ধতিতে প্রথমে বীজ তলায় বীজ বপন করে চারা উৎপন্ন করা হয়। আদর্শ বীজতলার আকার হবে ৩ মিঃ X ১ মিঃ অর্থাৎ প্রায় ১০ ফুট X ৩ ফুট। শ্রাবণ মাসের মধ্যে এ বীজতলায় ৫০-১০০ গ্রাম বীজ বপন করতে হবে। বীজ বপনের আগেই জমির জো বুঝে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি নরম করে মূল জমি প্রস্তুত করতে হয়।

বীজতলার চারার বয়স ২৫-৪০ দিন হলে চারাগুলো রোপনেরজন্যউপযুক্ত হয়। শ্রাবণ মাসে বপনকৃত বী থেকে উৎপাদিত চারা ভাদ্র মাসের প্রথম থেকে আশ্বিনের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোপন করা যায়। বীজত থেকে চারা তুলে নিয়ে প্রথমে ছায়ায় রাখতে হবে। প্রতিটি চারার ডগার ২/৩ টি ছোট পাতা রেখে অন্যা সব পাতার বোটা বাদে বাকী অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে দিতে হবে। বীজতলা থেকে যেদিন চারা তোলা হ ঐদিনই মূল জমিতে চারা রোপন করা ভাল। মূল জমিতে সারি করে চারা রোপন করতে হবে। সারি থে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সেঃ মিঃ এবং সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব ১০ সেঃ মিঃ। মেঘলা দিনে অথব সন্ধ্যার আগে যখন রোদ থাকে না তখন চারা রোপন করা উচিত। বীজ উৎপাদনের এ পদ্ধতি বিশে অবস্থায় অর্থাৎ সরাসরি বীজ বপন বা ডগা রোপনের জন্য জমি যখন খালি না থাকে বা বন্যার কারণে বীজ বপন বা ডগা রোপন সম্ভব হয় না তখন চারা রোপন পদ্ধতি ব্যবহারযোগ্য।

সার প্রয়োগঃ

জমিতে শেষ চাষের সময় প্রতি শতাংশ জমিতে ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১২০ গ্রাম এমপি সার প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে জিপসাম ও জিংকের অভাব থাকলে প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম জিপসাম এবং ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট এবং ৫০ গ্রাম বোরিক এসিড প্রয়োগ করতে হবে। রোপন করা চারার বয়স ২০-২৫ দিন এবং ৪০-৪৫ দিন পর নিড়ানী দেয়ার পর উপরি প্রয়োগ হিসাবে প্রতি শতাংশ জমিতে ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া সার দুই বার প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগের সার শুকনা ঝুরঝুরে মাটি অথবা ছাইয়ের সংগে মিশিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বীজ ফসলের পরিচর্যাঃ

আঁচড়া বা নিড়ি দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে রাখতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তির সার প্রয়োগের ২/১ দিন পূর্বে নিড়ানী দিয়ে জমির আগাছা পরিস্কার করতে হবে। শেষ বা ৩য় কিস্তির সার প্রয়োগের পূর্বে আর একবার নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিস্কার করতে হবে।

পাট, কেনাফ ও মেস্তার প্রধান প্রধান রোগ বালাই ও দমন ব্যবস্থাপনা

ফসলে সাধারণত তিন ধরনের যথাঃ ছত্রাক, ভাইরাস ও কৃমি জনিত রোগ হয়। ছত্রাক জনিত প্রধান রোগগুলো হলো- (১) চারা মড়ক, (২) ঢলে পড়া, (৩) কান্ড পচা, (৪) শুকনা ক্ষত, (৫) কালো পট্রি, (৬) আগা শুকিয়ে যাওয়া এবং (৭) পাতায় সাদা গুড়া পড়া। ভাইরাস জনিত প্রধান রোগ হলো- পাতায় হলদে ছিট পড়া রোগ বা মোজাইক এবং কৃমি জনিত রোগ হলো শিকড়ে গিট রোগ।

(১) চারা মড়কঃ

- বীজ বপনের পর প্রথম অবস্থায় যে রোগ দেখা দিতে পারে তা হচ্ছে চারা মড়ক।
- গাছের মোটামুটি ৩০ দিন বয়স পর্যন্ত চারা অবস্থা ধরা হয়। গাছ যখন ১ থেকে ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা হয় তখন এ রোগ দেখা দেয়।
- আক্রান্তগাছেরগোড়া কালো দাগ হয়ে গাছ মারা যায়।

চিত্র: মড়ক রোগাক্রান্ত চারা

দমনঃ

- চারা মড়কের কবল থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রধান উপায় হলো বীজ শোধন কারণ এটি বীজ বাহিত রোগ। বীজ বপনের আগে প্রোভেক্স-২০০, ০.৪% বা ৪ গ্রাম/কেজি হারে বীজ শোধন করে নিলে চারা মড়কের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- বাটা রসুন ১২৫ গ্রাম/কেজি হারে বীজে ভালভাবে মিশিয়ে পরপর তিনদিন রোদ্রে শুকিয়ে ১ মাসের মধ্যে বীজ বপন করলে এ রোগ দমন হয়।
- ১ গ্রাম ডাইথেন/মেনার/ইন্ডোফিল-এম ৪৫, ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে চারা গাছে ছিটিয়ে এ রোগ দমন করা যায়।

(২) কান্ড পচা রোগঃ

- এটি পাটের প্রধান রোগ।
- শুরুতে পাতায় ও গাছের কান্ডে বাদামী রং এর দাগ পড়ে আস্তে আস্তে গাঢ় রং এ পরিনত হয়।
- কালচে বাদামী বর্ণ স্থানে অসংখ্য বাদামী রংএর জীবাণুর স্পোর দেখা যায়।
- মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এ রোগের বিস্তৃতি দেখা যায়।
- দেশীওতোষা উভয় জাতের পাটেই এ রোগের প্রকোপ লক্ষ করা যায়।

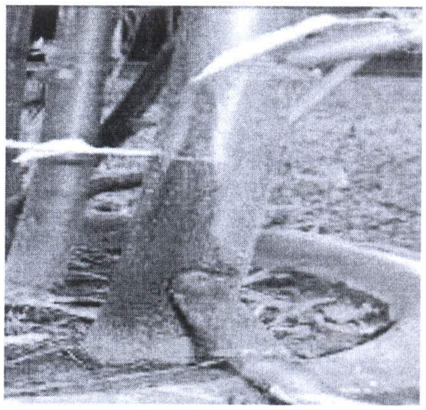

চিত্রঃ কান্ড পচা রোগ

দমনঃ

- চাষ করার সময় জমির সমস্ত আবর্জনা একসাথে করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ফলে মাটির দূষণ কমে এবং মাটিবাহী ছত্রাক মারা যায় এবং তার পরিমাণ কমে যায়।

- বীজ বপনের আগে প্রোভেক্স-২০০, ০.৪% বা ৪ গ্রাম/কেজি হারে বীজ শোধন করে নিলে কান্ড পচা রোগ ছাড়াও চারা মড়কের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- বাটা রসুন ১২৫ গ্রাম/কেজি হারে বীজে ভালভাবে মিশিয়ে পরপর তিনদিন রোদ্রে শুকিয়ে ১ মাসের মধ্যে বীজ বপন করলে এ রোগ দমন হয়।
- ২ গ্রাম ডাইথেন/মেনার/ইন্ডোফিলএম ৪৫, ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে চারা গাছে ছিটিয়ে দিলে রোগের প্রকোপ কমে।

(৩) শুকনা ক্ষত রোগঃ

- শুধু দেশী পাটে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- আক্রান্ত গাছের কান্ড ফেটে যায় এবং আঁশ ছিবড়ের মত বের হয়ে আসে।
- যার ফলে পাটআঁশের গুনাগুন খারাপ হয়ে যায় এবং দামও কমে যায়।

চিত্রঃ শুকনা ক্ষত রোগ

দমনঃ

- চাষ করার সময় জমির সমস্ত আবর্জনা একসাথে করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফলে মাটির দূষণ কমে এবং মাটিবাহী ছত্রাক মারা যায়।
- বীজ বপনের আগে প্রোভেক্স-২০০, ০.৪% বা ৪ গ্রাম/কেজি হারে বীজ শোধন করে নিলে চারা মড়কের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।
- বাটা রসুন ১২৫ গ্রাম/কেজি হারে বীজে ভালভাবে মিশিয়ে পরপর তিনদিন রোদ্রে শুকিয়ে ১ মাসের মধ্যে বীজ বপন করলে রোগ দমন হয়।
- ২ গ্রাম ডাইথেন/মেনার/ইন্ডোফিলএম ৪৫ ১ (এক) লিটার পানিতে মিশিয়ে চারা গাছে ছিটিয়ে সুফল পাওয়া যায়।

(৪) কালো পট্রি রোগঃ

- এ রোগের লক্ষন অনেকটা কান্ড পচা রোগের মত তবে এতে কালো রং এর বেষ্টনীর দাগ পড়ে।
- আক্রান্ত স্থান ঘষলে হাতে কালো দাগ লাগে।
- কালচে বাদামী অংশে অসংখ্য বাদামী রংয়ের জীবাণুর স্পোর দেখা যায়।
- সাধারনত তোষা পাটে এ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়।
- আক্রান্ত গাছ সাধারনত কান্ড পচা রোগের মত ভেঙ্গে পড়ে না তবে গোটা গাছটি শুকিয়ে মারা যায়।

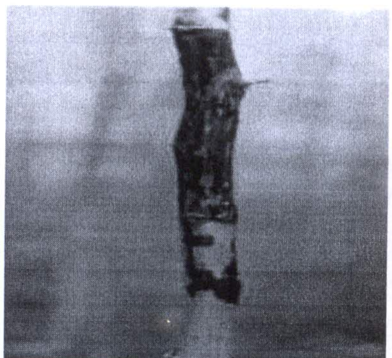

চিত্রঃ কাল পট্রি রোগ

দমনঃ

- চাষ করার সময় জমির সমস্ত আবর্জনা একসাথে করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফলে মাটির দূষন কমবে এবং মাটিবাহী ছত্রাক মারা যায়।

- বীজ বপনের আগে প্রোভেক্স-২০০, ০.৪% বা ৪ গ্রাম/কেজি হারে বীজ শোধন করে নিলে এ রোগ দমনের পাশাপাশি চারা মড়কের হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।
- বাটা রসুন ১২৫ গ্রাম/কেজি হারে বীজে ভালভাবে মিশিয়ে পরপর তিনদিন রোদ্রে শুকিয়ে ১ মাসের মধ্যে বীজ বপন করতে হবে।
- ২ গ্রাম ডাইথেন/মেনার/ইন্ডোফিলএম ৪৫ ১ (এক) লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৫) আগা শুকিয়ে যাওয়া রোগঃ

- দেশী ও তোষা উভয় জাতের পাটে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- ঝড়ে বা অন্য কোন কারণে গাছে আঘাত লাগলে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।
- এরোগেরলক্ষনহলোগাছেরআগাথেকেনীচেরদিকেশুকাতেথাকে এবং গাছটি ধীরে ধীরে বাদামী হয়ে এক সময় মারা যায়।

চিত্রঃ আগা শুকিয়ে যাওয়া রোগ

দমনঃ

- তোষা ও কেনাফএর জমিতে পর্যায়ক্রমে দেশী পাটের চাষ করলে রোগের প্রকোপ কমে।
- জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ২ গ্রাম ডাইথেন/মেনার/ইন্ডোফিলএম ৪৫ ১ (এক) লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৬) ঢলে পড়া রোগঃ

- সাধারনত তোষা পাটে এ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়।
- এ রোগে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে এবং শিকড় পচে যায়।
- ফুল আসার সময় এ রোগ বেশী দেখা যায়।

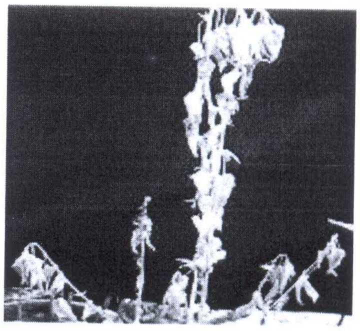

চিত্রঃ ঢলে পড়া রোগ

দমনঃ

- জমিতে এ রোগ দেখা দেয়া মাত্রই গাছ তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ২ গ্রাম ডাইথেন/মেনার/ইন্ডোফিলএম ৪৫ ১ (এক) লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৭) নরম পচা রোগঃ

- দেশী ও তোষা উভয় জাতের পাটে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়।
- এক নাগাড়ে কয়েকদিন বৃষ্টি হলে এবং জমিতে পানি জমে থাকলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।
- গাছের গোড়ায় কান্ডের উপর সাদা তুলার ন্যায় ছত্রাক দেখা যায় এবং পরে সরিষার দানার মত বাদামী রং এর জীবাণু দেখা যায়।
- এ রোগের ফলে গাছের গোড়া পচে যায় এবং গাছ ভেঙ্গে পড়ে।

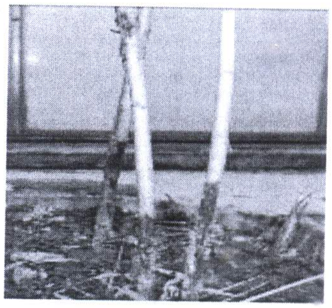

চিত্রঃ নরম পচা রোগ

দমনঃ

- চাষ করার সময় জমির সমস্ত আবর্জনা একসাথে করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফলে মাটি কম দূষিত হয় এবং মাটিবাহী ছত্রাক মারা যায়।
- জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বর্দ্দো মিক্সার এর ১ পাউন্ড (৪৫০গ্রাম) ১০ গ্যালন বা৪.৫লিটারপানিতে মিশিয়ে জমি ভালভাবে ভিজিয়ে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

(৮) পাতার হলদে সবুজ ছিট পড়া বা মোজাইকঃ

- এটি পাটের ভাইরাসজনিত রোগ। সাধারনত: দেশি পাটে এর প্রকোপ বেশী লক্ষ করা যায়।
- পাতায় হলদে সবুজ ছিট দাগ পড়ে এবং আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।
- আশেঁর পরিমান শতকরা ৫০% পর্যন্ত কমে যাওয়ার আশংকা থাকে।

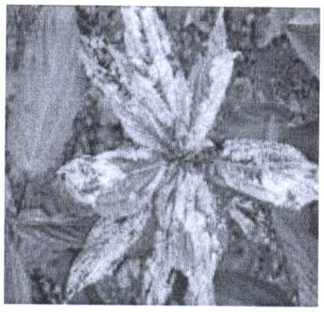
চিত্রঃ মোজাইক রোগ

দমনঃ

- প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে নীরোগ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- জমিতে এ রোগ দেখা দেয়া মাত্রই আক্রান্ত গাছ তুলে মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- ভাইরাসেরবাহক সাদা মাছি দমনের জন্য পাট ক্ষেতে ১৫ মিলি ডায়াজিনন/হেয়জিনন, ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে ছিটিয়ে দিতে হবে।

(৯) শিকড় গিট রোগঃ

- দেশী ও তোষা উভয় জাতের পাটে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। এটি ক্রিমি জনিত রোগ।
- এ রোগে আক্রান্ত গাছের শিকড়ে ছোট বড় অনেক গিট দেখা যায় ফলে শিকড় তার স্বাভাবিক কাজ যেমন পানি ও খাদ্যোপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। তাই ধীরে ধীরে গাছ দুর্বল হয়ে এক সময় মরে যায়।
- বালিযুক্তহালকামাটিএবংস্যাঁতস্যাঁতেজমিতেএ রোগের প্রকোপ বেশী দেখা যায়।

চিত্রঃ শিকড় গিট রোগ

দমনঃ

- ফুরাডান ৫ জি, ৪০ কেজি/হেক্টর হারে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- জমি কিছুদিন পানি দ্বারা প্লাবিত করে রাখলে এ রোগের জীবানু বা কৃমি মারা যায়।

পাট, কেনাফ ও মেস্তার প্রধান প্রধান পোকামাকড় এবং দমন ব্যবস্থাপনা

(১) উড়চুঙ্গাঃ

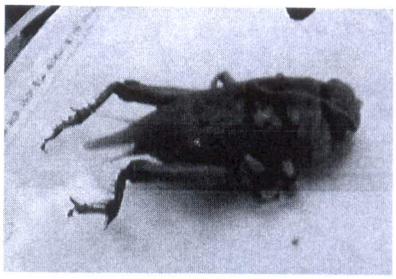

চিত্রঃ উড়চুঙ্গা

- এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত উড়চুঙ্গার আক্রমন দেখা যায়।
- পূর্ণ বয়স্ক উড়চুঙ্গা কালো বাদামী রংয়ের এবং ৫ সে.মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের মুখ দেখতে ফড়িং এর মত। পেছনের পা জোড়া বেশ মোটা, পায়ে সারি সারি কাঁটা আছে। খরার সময় শুকনো ক্ষেতে এদের আক্রমন বেশী দেখা যায়।
- সাধারনত এরা বেলে ও বেলে দোঁয়াশ মাটিতে সুড়ঙ্গা তৈরী করে বাস করে।
- এরা দিনের বেলা গর্তের ভিতরে থাকে এবং সন্ধ্যায় গর্ত থেকে বের হয়ে গাছ কেটে গর্তের ভিতরে নিয়ে যায়। ফলে গাছের সংখ্যা কমে যায় প্রকারান্তরে বীজের ফলন কমে যায়।

দমনঃ

- যে সব জায়গায় উড়চুঙ্গার আক্রমন বেশী হয় সেখানে সাধারণ পরিমাণের চেয়ে ২০% বেশী হারে বীজ বপন করা ভাল। যাতে উড়চুঙ্গার ক্ষতি পোষিয়েও প্রয়োজনীয় সংখ্যক গাছ পাওয়া যায়।
- আক্রান্ত জমিতে গাছের উচ্চতা ২০ সে.মি. হওয়ার পর বাড়তি চারা বাছাই করা যেতে পারে।
- যে সব জমিতে প্রতি বছর উড়চুঙ্গা দ্বারা আক্রান্ত হয়, সে সব জমিতে সম্ভব হলে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে দুই সপ্তাহ দেরীতে বীজ বপন করলে আক্রমন কম হয়।
- আক্রমন বেশী হলে ডার্সবান ২০ ইসি, ডায়এলড্রিন ৪০ ডব্লিউপি, ২ মি.লি./লিটার পানিতে এবং অলড্রিন ৪০ ইসি, ১.৫ মি.লি./লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

(২)বিছা পোকা বা শুয়ো পোকাঃ

চিত্রঃ বিছা বা শুয়ো পোকা

- এদের গায়ে অসংখ্য শুয়ো গুচ্ছাকারে সাজানো থাকে।
- স্ত্রী মথ পাটের পাতার উল্টা দিকে গাদা করে ডিম পাড়ে।
- ডিম থেকে বাচ্চা বের হওয়ার পর প্রায় ৬-৭ দিন পর্যন্ত বাচ্চা গুলো পাতার উল্টো দিকে দলবদ্ধভাবে থাকে।

- দলবদ্ধভাবে থাকা অবস্থায় কীড়াগুলো পাতার উল্টো পিঠের সবুজ অংশ খেয়ে পাতাকে সাদা পাতল পর্দার মত করে ফেলে।
- বড় হওয়ার সাথে সাথে এরা সারা মাঠ ছড়িয়ে পড়ে এবং পুরো পাতা খেতে শুরু করে।

দমনঃ

- পাটের পাতায় ডিমের গাদা দেখলে তা তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- আক্রমনের প্রথম অবস্থায় কীড়াগুলো যখন পাতায় দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে তখন পোকা সমেত পাতা তুলে পায়ে মাড়িয়ে বা গর্তে চাপা দিয়ে বা কেরোসিন মিশ্রিত পানিতে ডুবিয়ে মারতে হবে।
- বিছা পোকা যাতে এক ক্ষেত থেকে অন্য ক্ষেতে ছড়াতে না পারে, সেজন্য প্রতিবন্ধক নালা তৈরী করতে হবে।
- ফসল কাটার পর জমি চাষ দিয়ে ফেলে রাখতে হবে যাতে পুত্তলীগুলো মারা যায় ও পাখী বা অন্যান প্রাণি সেগুলো খেয়ে পরবর্তীতে পোকার সংখ্য কমিয়ে দেয়।
- আক্রান্ত ক্ষেতে হেয়জিনন ৬০ ইসি, রিভা ২৫ ইসি এবং কারাতি ২ বা ৫ ইসি, ১মি.লি./লিটার, রিপকর্ড ১০ ইসি এবং সিমবুশ ১০ ইসি, ৫ মি.লি./লিটার হারে স্প্রে করতে হবে।
- পাট ক্ষেতে গাছের ডাল বা বাঁশের আড়ি পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করলে এরা পোকা খেয়ে পোকার সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

(৩) ঘোড়া পোকাঃ

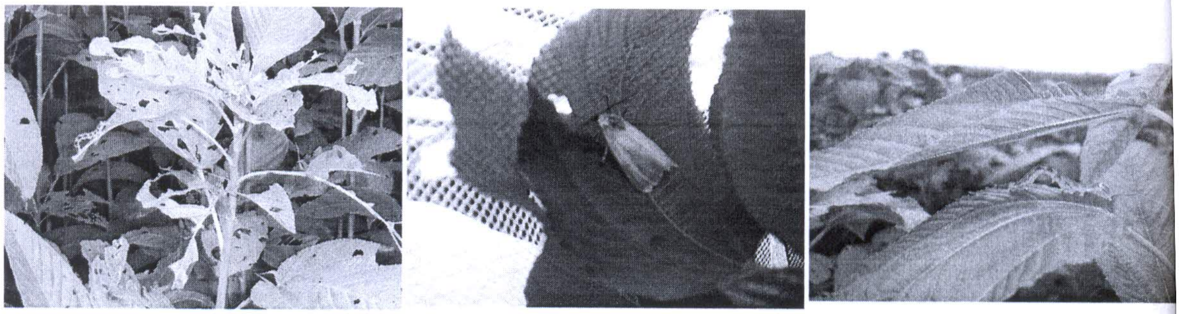

চিত্রঃ ঘোড়া পোকা

- স্ত্রী মথ পাতার নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ডিম পাড়ে।
- ঘোড়া পোকা পাট গাছের কচি ডগা ও পাতা আক্রমন করে।
- বার বার কচি ডগা আক্রমনের জন্য গাছের আগা নষ্ট হয়ে যায় এবং শাখা প্রশাখা বের হয়। এতে পাটের ফলন ও আশেঁর মান কমে যায়।

দমনঃ

- পাট ক্ষেতে পোকার আক্রমন দেখা দিলে কেরোসিন ভেজানো দড়ি গাছের উপর দিয়ে টেনে নিলে পোকার আক্রমন কমে যায়।
- শালিক বা ময়না জাতীয় পাখি ঘোড়া পোকা খেতে পছন্দ করে। পাট ক্ষেতে গাছের ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করলে এরা পোকা খেয়ে পোকার সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

- আক্রমন বেশী হলে হেয়জিনন ৬০ ইসি, রিভা ২৫ ইসি এবং কারাতি ২ বা ৫ ইসি, ১মি.লি./লিটার, রিপকর্ড ১০ ইসি এবং সিমবুশ ১০ ইসি,৫ মি.লি./লিটার হারে স্প্রে করতে হবে।

(৪) চেলে পোকাঃ

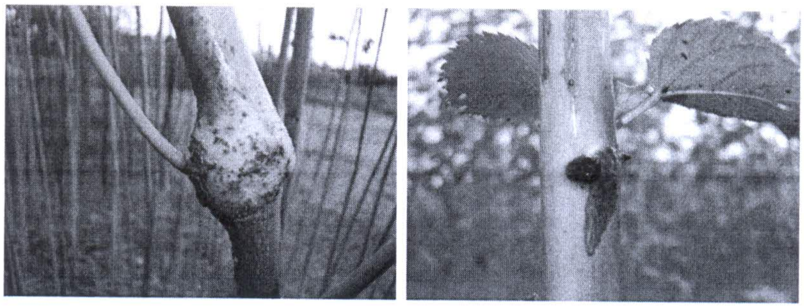

চিত্রঃ চেলে পোকা আক্রান্ত গাছ

- পূর্ণ বয়স্ক চেলে পোকা এক ধরনের ছোট কালো রং এর শুড় বিশিষ্ট পোকা।
- স্ত্রী পোকা তার শুড় দ্বারা গাছের ডগা, পর্ব বা গিটে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে।
- পাট গাছের চারা অবস্থায় চেলে পোকা আলপিনের ছিদ্রের মতে করে পাতা খায়। তারপর ডিম পাড়ার জন্য স্ত্রী পোকা চারাগাছের কচি ডগায় আক্রমন করে।
- ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে ডগার ভিতরে চলে যায় এবং সেখানেই বড় হতে থাকে। ফলে গাছের ডগা মারা যায় এবং শাখা প্রশাখা বের হয়।
- আক্রান্ত স্থান থেকে এক প্রকার আঠা জাতিয় পদার্থ বের হয়ে আসে এবং কীড়ার মলের সাথে শক্ত গিটের সৃষ্টি করে। পাট পচানোর সময় সেই গিট পচেনা।ফলে আঁশের মান ক্ষুন্ন হয় ও দাম কম পাওয়া যায়।

দমনঃ

- পাট ক্ষেতের পাশে বনওকড়া গাছ এবং অন্যান্য আগাছা পরিস্কার রাখলে এ পোকার আক্রমন কম হয়।
- পাট মৌসুমের প্রথমে ডগা আক্রান্ত চারাগুলো তুলে ফেললে পরবর্তীতে এদের আক্রমন কমে যায়।
- আক্রমন বেশী হলে সুপারথিন ১০ইসি, ০.৫ মি.লি./লিটার, রিপকর্ড ১০ ইসি এবং সিমবুশ ১০ ইসি ০.৫ মি.লি./লিটার হারে স্প্রে করতে হবে।

(৫) হলুদ মাকড়ঃ

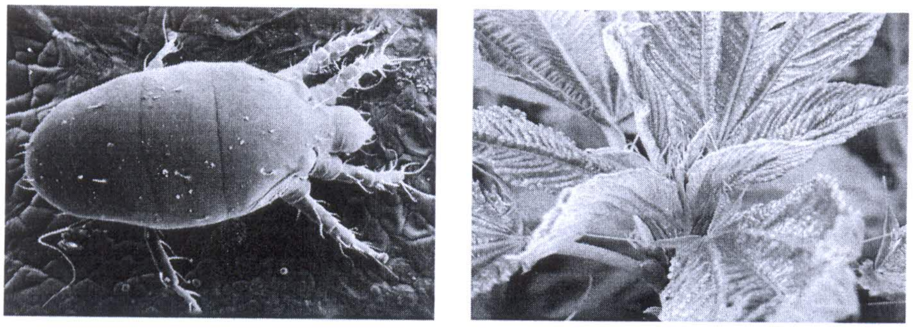

চিত্রঃ হলুদ মাকড় ও আক্রান্ত গাছ

- পাটের পোকামাকড়ের মধ্যে হলুদ মাকড় এখন সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকারক।
- পাটের আঁশ ও বীজ উভয় ফসলেরই এরা ব্যাপক ক্ষতি করে।
- পূর্ণাঙ্গ মাকড় খুবই ক্ষুদ্র এবং খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আক্রান্ত কচি পাতার উল্টো দিকে ভালমত পরীক্ষা করলে এদেরকে সাদা গুড়োর মত দেখা যায়।
- এ মাকড় পাটের কচি পাতা আক্রমন করে পাতার রস চুষে খায়। এতে কচি পাতা কুচঁকে যায় এবং তামাটে রং ধারন করে।
- আক্রমনের প্রকোপ বাড়লে পাতা ঝড়ে পড়ে ও গাছের ডগা নষ্ট হয়ে যায়, ফলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় ও পরে শাখা প্রশাখা বের হয়।

দমনঃ

- আক্রমন বেশী হলে সালফার জাতীয় যে কোন ঔষধ যেমন- সালফার ৮০ ডব্লিউপি, সালফেক্স ৮০ ডব্লিউপি, কুমুলাস ৮০ ডিএফ, রনোভিট ৮০ ডব্লিউপি, প্রসালফ ৮০ ডিএফ, নিওরোন ৫০০ ইসি, ২.৫ গ্রাম/লিটার (২.৫০ কেজি/হে.) হারে স্প্রে করতে হবে।
- নিম পাতা বেঁটে পানিতে মিশিয়ে (১:২০) এর নির্যাস/রস তৈরী করে আক্রান্ত পাট গাছের কচি পাতায় ছিটালে ভাল ফল পাওয়া যায়। হলুদ মাকড় দমন করতে হলে পরপর দুই দিন ঔষধ ছিটালে ভাল ফল পাওয়া যায়। ঔষধ ছিটানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে পাতার উল্টো পিঠ যেন ভালোভাবে ভিজে।

(৬) ছাতরা পোকাঃ

- পোকাগুলো একসাথে থাকে ও এদের উপরিভাগ সাদা তুলার মতো গুড়ায় আবৃত থাকে।
- ছাতরা পোকা গাছের ডগায় দল বেঁধে বাস করে এবং কচি ডগা ও পাতার রস চুষে খায়।
- কচি ডগা ও পাতাগুলো কুকঁড়ে যায় এবং আক্রান্ত স্থান ফুলে উঠে।
- পাতা গুলো ঝড়ে যায় এবং আক্রান্ত স্থান হতে শাখা প্রশাখা বের হয়।

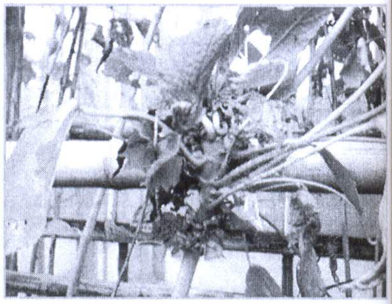

চিত্রঃ ছাতরা পোকা আক্রান্ত গাছ

দমনঃ

- মাঠে ২/১ টি গাছে আক্রমন দেখা দেয়ার সাথে সাথে আক্রান্ত গাছগুলোর ডগা কেটে ফেলে পায়ে মাড়িয়ে বা পুড়িয়ে পোকা ধ্বংস করতে হবে।
- আক্রমন বেশী হলে হেয়জিনন ৬০ ইসি, রিপকড ১০ ইসি এবং সিমবুশ ১০ ইসি,৫ মি.লি./লিটার হারে স্প্রে করতে হবে।

(৭) কেনাফ স্পাইরাল বোরারঃ

চিত্রঃ স্পাইরাল বোরার আক্রান্ত গাছ

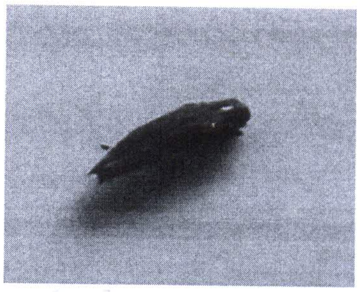

চিত্রঃ স্পাইরাল বোরার

- এদের রং উজ্জ্বল নীল। সাধারনত ৪-৬ মি.মি. লম্বা। এদের মাথা ছোট, শরীর লম্বা।
- ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ছালের নীচের নরম অংশ খেতে শুরু করে।
- কীড়া কান্ডের নীচের দিক হতে ছালের ভিতরে আক্রমন করে স্ত্রুর মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠতে থাকে।
- আক্রান্ত স্থানগুলো ফুলে উঠে ও পরে এ সমস্ত স্থানে গিরার সৃস্টি হয়।
- কখনও কখনও ঝড় বাদলে আক্রান্ত স্থান ভেঙ্গে যায়। ফলে আশেঁর মান ক্ষুন্ন হয় এবং ফলনও কম হয়।

দমনঃ

- আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বন্যা/বৃষ্টির পানিতেপ্লাবিত হয় এমন ক্ষেতে কেনাফ চাষ করলে এ রোগের আক্রমন কমানো সম্ভব, এমনকি এড়ানো যায়।
- আক্রমন বেশী হলে হেয়জিনন ৬০ ইসি, রিপকর্ড ১০ ইসি এবং সিমবুশ ১০ ইসি,৫ মি.লি./লিটার হারে স্প্রে করতে হবে।

পাট ও পাট জাতীয় বীজ ফসলের জমির জন্য উপযুক্ত নিষ্কাশন ব্যবস্থ

এই ব্যবস্থার সুবিধা পেতে হলে সারিতে পাট বোনা অপরিহার্য। সারিতে পাট বপন করে জমির যে দিক উপযুক্ত নিষ্কাশন (স্থায়ী) নালা আছে সে দিকেই জমিতে জমে থাকা অতিরিক্ত পানি সরে যাওয়ার ব্য করে দিতে হয়। দুই সারি পাট গাছের মাঝ বরাবর জমির যে দিকে নিষ্কাশন নালা আছে তার উল্টা দি হতে হ্যান্ডহো বা ছোট-চিকন কোদাল দিয়ে সরু অগভীর নালা (ফারো) করে দিতে হয়। নালাটির গভী নিষ্কাশন নালার দিকে ক্রমেই গভীর হওয়া জরুরী। নিম্নোক্ত চিত্রটির মাধ্যমে পাটের জমির উপ নিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখানো হলো।

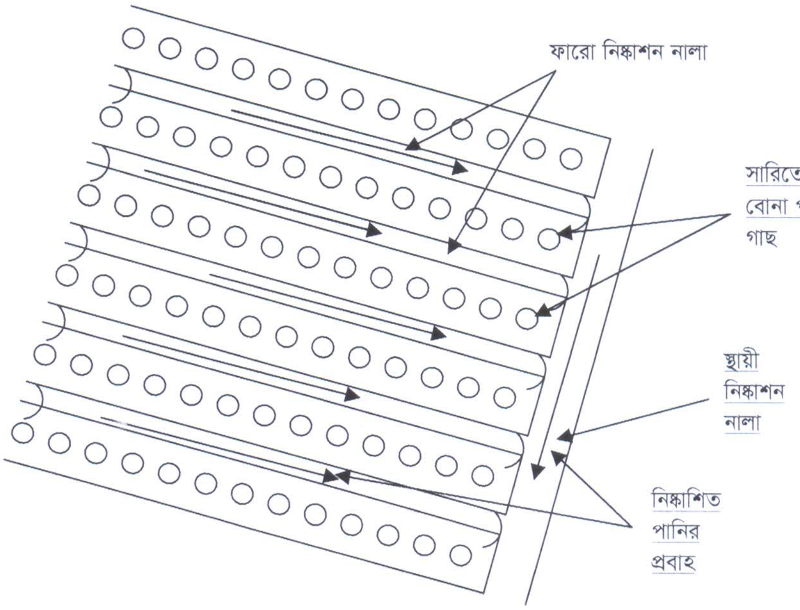

চিত্রঃ পাটের জমির জন্য উপযুক্ত ফারো নিষ্কাশন ব্যবস্থা।

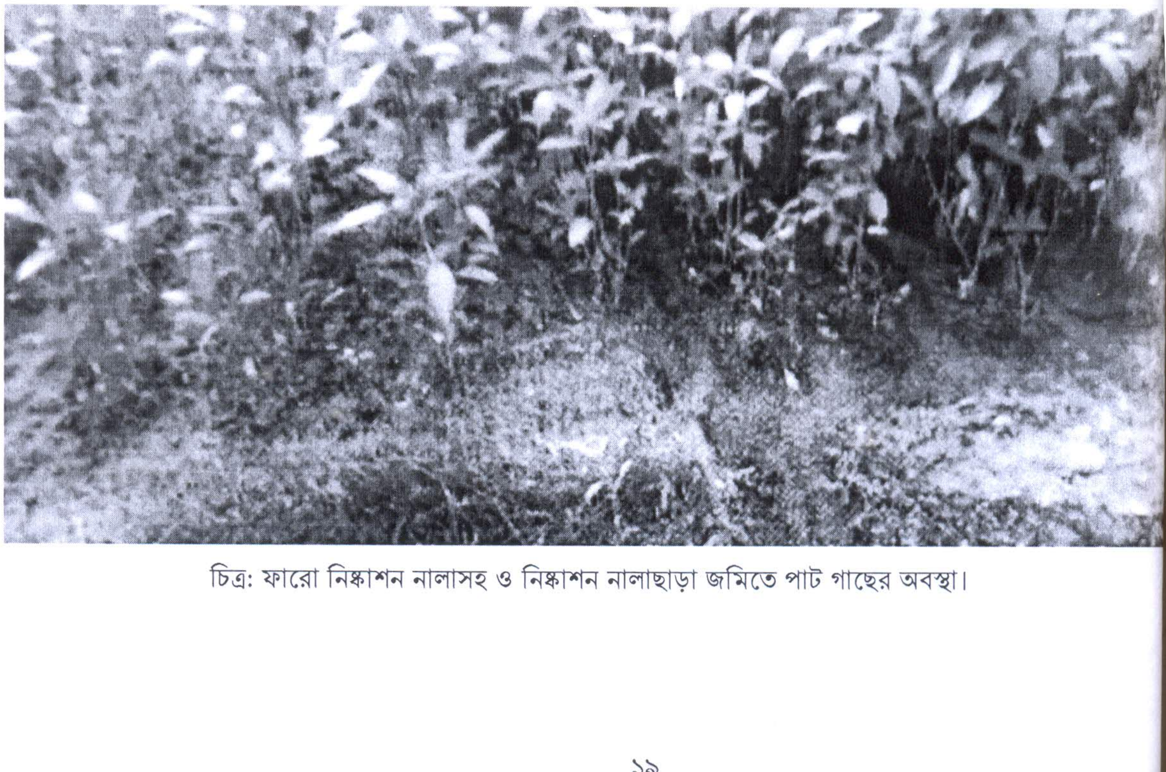

চিত্র: ফারো নিষ্কাশন নালাসহ ও নিষ্কাশন নালাছাড়া জমিতে পাট গাছের অবস্থা।

পাট ও পাট জাতীয় বীজ ফসল কর্তন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি

কৃষকগণ যাতে নিজের বীজ নিজেই উৎপাদন করতে এবং সেগুলো সঠিক পদ্ধতিতে গুদামজাত করে সংরক্ষণ করতে পারেন সেজন্য উন্নত পদ্ধতিতে বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কলাকৌশল সম্পর্কে তাদের ধারনা থাকা দরকার।

পাট ও কেনাফ বীজ সংগ্রহ ও গুদাম জাত করনের ধাপসমূহ হল-

বীজ ফসল কাটা ⟶ মাড়াই করা ⟶ শুকানো ⟶ সংরক্ষণ করা

চিত্রঃ পরিপক্ক দেশী পাট বীজ ফসল

পাট বীজ বেশী পাকলে ফল ফেটে বীজ জমিতেই ঝরে পড়ে অথবা ফলের খোসা ফেটে যায়। রাতের বেলায় সেই ফাটলে কুয়াশার পানি চুইয়ে ফলের ভিতরে জমে বীজের মান খারাপ করে দেয়, আবার কম পাকলে বীজ চিটা হওয়ার আশংকা থাকে। তাই, শতকরা ৬০-৭০ ভাগ ফল বাদামী রং ধারণ করলে গাছের গোড়া সমেত কেটে ফসল সংগ্রহ করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, জমির এক এক অংশের রসের উপরনির্ভরকরে গাছের ফলে পাকার সময়ও ভিন্ন হয়ে যায়। এটা জাতের চেয়ে জমির অবস্থার উপর অধিক নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে একাধিকবার বীজ ফসল সংগ্রহ করলে সকল বীজই ভাল পাওয়া যায়। আঁশ ফসল থেকে বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে দেশী পাট প্রায় ১৯৪ দিন ও তোষা পাট প্রায় ১৭৮ দিন বয়সে শারীরতাত্ত্বিক ভাবে পরিপক্ক হয়।

বীজ ফসল কর্তনঃ

চিত্রঃ পরিপক্ক তোষা পাট বীজ ফসল

বীজ কাটার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ফসল কাটার দিনটিশুকনো হয়। বৃষ্টি ভেজা দিনে পাকা ফসলসহ গাছ না কাটাই ভাল। বীজ ফসল কর্তনের সময় জমিতে মরা ও শুকনা গাছগুলি বাদে বীজ ফসল সংগ্রহ করতে হবে। মরা ও রোগক্রান্ত গাছ একই সাথে কর্তন করলে সমস্ত বীজ রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। বীজ ফসলের ক্ষেত্রে বীজের পরিমানের চেয়ে গুনগত মান অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন রোগাক্রান্ত গাছ থেকে কোন অবস্থাতেই বীজ সংগ্রহ করা না হয়।

প্রক্রিয়াজাতকরণঃ

চিত্রঃ মাড়াইয়ের আগে ফলসহ রোদে দেয়া গাছ

বীজসহ গাছ সংগ্রহের পর গাছ বা ডগা ২/৩ দিন শুকিয়ে বীজ মাড়াই করতে হবে। প্রতিদিন শুকানোর শেষে গাছগুলো ঠান্ডা হলে পলিথিন বা কোন আবরণ দিয়ে রাতের কুয়াশা বা বৃষ্টি থেকে গাছগুলোকে ঢেকে রাখতে হবে। বীজ মাড়াই করে, পর পর ৫/৬ দিন পূর্ণ রোদে ভালভেবে শুকিয়ে তারপর পাট, কেনাফ ও মেস্তা বীজ সংরক্ষণ করা উচিত।

বীজ অবশ্যই ত্রিপল বা চট জাতীয় কোন কিছুর উপর অথবা ভালভাবে গোবর দিয়ে লেপা শুকনো
শুকাতে হবে। অন্যথায় গরম মেঝের সংস্পর্শে বীজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ ভ্রূণ নষ্ট হয়ে যেতে
ভালভাবে শুকানোর পর গুকানো বীজকে দুই দাঁতের ফাঁকে নিয়ে চাপ দিলে যদি কট করে বীজটি
যায়, তাহলে বুঝতে হবে বীজ ভাল ভাবে শুকানো হয়েছে।

সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ

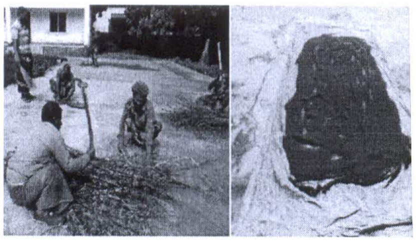

চিত্রঃ বীজ মাড়াই ও রোদে শুকানো

বীজ শুকানোর পর বীজ ভাল করে ঠান্ডা করে বায়ুরোধী পাত্রে ঠান্ডা জায়গায় বা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গুদাম ঘরে সংরক্ষণ করলে বীজের মান বহুদিন ভাল থাকবে। বীজের আর্দ্রতা শতকরা ৮-১০ এর কাছাকাছি অবস্থায় টিনের কৌটা, প্লাষ্টিকের ক্যান, প্লাষ্টিক ড্রাম ইত্যাদি বায়ুরোধী পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। বড় কোন পাত্রে অল্প পরিমান বীজ রাখা ঠিক হবে না। এতে পাত্রের খালি অংশে যে বাতাস থাকে তার আর্দ্রতা বীজের গুনগত মান ব
করে দিতে পারে। সঠিক আর্দ্রতায়, সাধারণ তাপমাত্রায় লেমোফয়েল ব্যাগে বীজ সংরক্ষণ করলে ৩
পর্যন্ত তা ভাল থাকে। বায়ুরোধী প্লাষ্টিক বা টিনের পাত্রে সংরক্ষণকৃত বীজ ২ বছর পর্যন্ত ভাল থ
দীর্ঘদিন পাট ও কেনাফ বীজ সংরক্ষণ করতে চাইলে মাঝে মাঝেই বীজ বের করে ভাল করে
শুকিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করে পুনরায় সংরক্ষণ করতে হবে।

বাণিজ্যিক পর্যায়ে বীজ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুদাম ঘরের তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা যাতে নিয়ন্ত্রিত থাকে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বীজ হল এক সুপ্ত জীবন্ত সত্তা যার কার্যকরকাল নির্ভর করে সংরক্ষণ পরিবেশ অর্থাৎ আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার উপর।

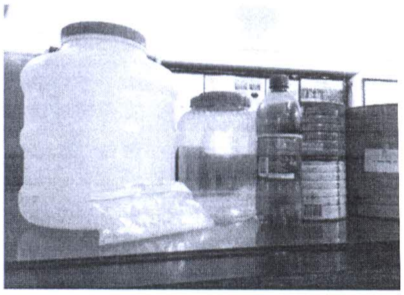

চিত্রঃ বীজ সংরক্ষণযোগ্য পাত্র

বীজের ফলনঃ

বীজের ফলন বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভরশীল যেমন: উৎপাদন পদ্ধতি, উৎপাদনের এলাকা, উৎপাদ
সময়, ব্যবস্থাপনা, সর্বোপরি অবহাওয়াগত অবস্থা। সঠিক সময়ে বপন এবং সঠিক ব্যবস্থাপনায় বি
পদ্ধতিতে পাট বীজের নিম্নরূপ ফলন পাওয়া সম্ভব।

উৎপাদন পদ্ধতি	পদ্ধতির প্রকারভেদ	ফলন	
		কেজি/হেক্টর	কেজি/শতাংশ
প্রচলিত পদ্ধতি	আঁশ ফসলের একাংশ থেকে	১৫০-২০০	০.৬-০.৮
আধুনিক পদ্ধতি	সরাসরি বীজ বপন পদ্ধতি	৬০০-১০০০	২.৪-৪.০
	কান্ড ও ডগা রোপন পদ্ধতি	৬০০-৯০০	২.৪-৩.৬
	চারা রোপন পদ্ধতি	৬০০-৮০০	২.৪-৩.২

পাটও পাট জাতীয় বীজ ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস ও তার গুরুত্ব

প্রাচীন কাল হতেই কৃষক সম্প্রদায় শস্য বিন্যাস এবং ফসলের আবর্তনে বিভিন্ন হিতকর ফলাফল সম্পর্কে অবগত আছেন। এদেশের কৃষকগণও এর ব্যতিক্রম নয়। কৃষি বিজ্ঞানে শস্য বিন্যাস ও শস্য আবর্তন কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনার অন্যতম বিষয়। এ ব্যবস্থাপনায় বছরের পর বছর কোন জমিতে একই ফসল বার বার চাষ না করে একাধিকবিভিন্ন প্রকারের ফসল ধারাবাহিকভাবে অবর্তন করানো। যা একক পরিমাপের জমিতে ফসলের ফলন বৃদ্ধির নিশ্চিত ভূমিকা পালন করে। একটি নির্দিস্ট জমিতে বা একটি সুনির্দিষ্ট এলাকায় এক বছরে যে সকল ফসল জন্মানো হয় তার ক্রম বা ধারাবাহিকতাকে ঐ জমির বা ঐ এলাকার শস্য বিন্যাস বুঝায়। যেমন একটি জমিতে বছরে তিনটি ফসল গম, পাট ও রোপা আমন ধারাবাহিকভাবে জন্মানো অর্থাৎ গম- পাট- রোপা আমন হলো ঐ জমির শস্য বিন্যাস। কোন নির্দিস্ট জমিতে পাট জাতীয় বীজ ও অন্যান্য ফসল ধারাবাহিকভাবে জন্মানোই পাট জাতীয় বীজ ভিত্তিক ফসলের শস্য বিন্যাস। শস্য বিন্যাসের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে মিশ্র ফসল, আন্তঃফসল, সাথীফসল অন্যতম। বাংলাদেশের কৃষকগণ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মিশ্র ও সাথী ফসলের চাষ করে থাকেন। কিছু ফসল, যেগুলো ভিন্ন সময়ে পাকে এবং যাদের বাড়-বাড়তির প্রকৃতিও ভিন্ন তা এক সাথে বপন করলে সেগুলো মাটির বিভিন্ন স্তর থেকে খাদ্য উপাদান আহরণ করে এবং কার্যকরভাবে সৌরশক্তি গ্রহণ করে। মিশ্র ফসলে পোকামাকড়, রোগবালাই এবং আবহাওয়াজনিত ঝুঁকিসমূহ হ্রাস পায়। যেমন- পাট জাতীয় বীজ ফসল-লাল শাক/মূলা-মাসকালাই/মসুর। আখ ফসল বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে সাথী ফসল হিসেবে পাট বীজ,আলু, ডাল এবং তৈলবীজ জাতীয় শস্যের চাষ সফল প্রমানিত হয়েছে। মিশ্র এবং সাথী ফসলের মোট ফলন একক ফসলের চেয়ে অধিক হয়।

পাট বীজ ভিত্তিক কতিপয় শস্য বিন্যাসঃ

১। পাট বীজ-রসুন/পাট-ডাল/মসলা/পেয়াজ

২।পাট বীজ+মিশ্র সবজি ফসল-আমন

৩। পাট বীজ+লালশাক-মাসকলাই-পাট

৪। পাট বীজ+ডাটা - পাট- পিয়াজ

৫। পাট বীজ-বোরো ধান- পাট ইত্যাদি।

পাট জাতীয় বীজ ফসলটি যে সময়ে জন্মানো হয় সে সময়ে দেশের প্রায় সমস্ত অঞ্চলই রোপা আমন ধানের আবাদ হয়, যার ফলে পাট বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত জমির ঘাটতি থাকে। অথচ ঐ সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আগাম শীতকালীন সব্জির জমিতে পাট বীজ উৎপাদন করলে একদিকে যেমন অতিরিক্ত জমি ও সারের প্রয়োজন হয় না অন্য দিকে কৃষকগণ তাদের নিজের প্রয়োজনীয় পাট বীজ অনায়াসেই উৎপাদনে সক্ষম হতে পারেন। এছাড়াও বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে নতুন নতুন ফলের বাগান যেমন আম, লিচু, পেয়ারা , কুল, মাল্টা, বেদানা, ড্রাগনফল ইত্যাদির চাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসকল ফল বাগানের প্রথম থেকে ৪/৫ বছর পর্যন্ত যখন চারা গাছ ছোট থাকে ততদিন পর্যন্ত ঐ সকল ফলের বাগানে মিশ্র ফসল হিসাবে লাভজনক উপায়ে পাট জাতীয় বীজ আবাদ করা যায়। বিষয়টি সবিস্তারে পরবর্তী সেকশনে বর্ণণা করা হয়েছে।

শীতকালীন শাক সব্জির সাথে পাট জাতীয় বীজ ফসল উৎপাদন প্রযু

প্রযুক্তির উপযোগিতাঃ

- এ প্রযুক্তিটি সারা দেশ ব্যাপী ব্যবহার উপযোগী এবং শীতকালিন শাক-সব্জির সাথে সাথী হিসেবে পাট বীজ উৎপাদন করে কৃষকের পাট বীজের এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পুষ্টির মেটানো যায়।
- শীতকালে অর্থাৎ রবি মৌসুমে আগাম শাক-সব্জির জমিতে লালশাক, মূলা, পালংশাক, টমেটো পাট বীজ একই সাথে সারিতে চাষ করে অধিক আয় ও পুষ্টি পাওয়া যায়।
- প্রান্তিক ও মাঝারী কৃষকগণ এ পদ্ধতিতে অল্প জমিতে অধিক ফসল চাষ করতে পারেন ও উৎপাদন করায় সব্জির বাজার চাহিদা ভাল থাকে ও ভাল দাম পাওয়া যায়।
- শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি (অগাষ্টের প্রথম) থেকে পুরো ভাদ্রমাস (১৫ সেপেটম্বর) উচু জমিতে বৃষ্টি হলেও পানি জমেনা সেরকম জমিতে এ পদ্ধতি ব্যবহার উপযোগী।

মাঠ পর্যায়ে করণীয়ঃ

- উঁচু জমি যেখানে বৃষ্টি হলেও পানি জমেনা সেরকম জমি নির্বাচন করতে হবে।
- শীতকালীন শাক-সব্জির সাথে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি (অগাষ্টের প্রথম) থেকে পুরো ভাদ্রমাস (১৫ সেপ্টেম্বর) জুড়ে এ পদ্ধতিতে পাট বীজ বপন করা যায়। তবে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জন্য মধ্য শ্রাবণ থেকে মধ্য ভাদ্র এবং দক্ষিণাঞ্চলের জন্য মধ্য শ্রাবণ থেকে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত পাট বীজ বপন করা উত্তম।

চিত্রঃ শীতকালীন শাক সব্জী (টমেটো ও শাক এর সাথে পাট বীজ উৎপাদন

- শতাংশ প্রতি ২০ কেজি জৈব সার (গোবর/কম্পোষ্ট) বীজ বপনের ২০-২১ দিন পূর্বে প্রথম চা সময় প্রয়োগ করে ভাল ভাবে জমি চাষ করতে হবে।

- জমির শেষ চাষের সময় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। শতাংশ প্রতি ইউরিয়া ৯০০ গ্র টিএসপি ৬০০ গ্রাম, এমপি ৩৭৫ গ্রাম, জিপসাম ৬০০, জিংকসালফেট ৪০ গ্রাম ও বোরাক্স ৪০ গ্র প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩০০ গ্রাম ইউরিয়াসহ অন্যান্য সকল সার শে চাষের সময় মাটিতে দিয়ে চাষ করে মিশিয়ে দিতে হয় তারপর মই দিয়ে মাটি সমান করে লাই বীজ বপন করতে হয় এবং মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়। অবশিষ্ট ইউরিয়ার ৩০০ গ্রাম এ আগাছা পরিষ্কার ও মাটি আলগা করে দিয়ে বিকেল বেলা জমিতে উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

- প্রথমে ক্ষেতের/প্লটের চারপাশে মূলাশাক/পালংশাক-এর বীজ ক্ষেতের সীমানা/বর্ডার থেকে ১ সেন্টিমিটার ভিতরে চারদিকে লাইনে বপন করতে হয়। তারপর মূলা/পালংশাকের লাইন থেকে ১ সে.মি. ভিতরে প্রথমে দুই লাইন পাট তারপর দুই লাইন সব্জি এবং প্রতি দুই লাইন ফসল (পাট/সব্জি এর মাঝে এক লাইন করে লালশাক বপন করতে হয়।

- শীতকালিন শাক-সব্জির সাথে নাবী পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতিতে লালশাক, পালংশাক, মূলাশাক/মুলা, বেগুন, টমেটো ইত্যাদি চাষ করা যায়। এ পদ্ধতিতে সকল প্রকার ফসল লাইনে বপন করা হয় এবং পাট বীজ ফসলের সাথে শাক-সব্জি বপনের প্রতি দুই লাইন পাটের পর এক লাইন সব্জি বপন/লাগান হয় তারপর আবার দুই লাইন পাটের পর এক লাইন সব্জি এভাবে পর্যায়ক্রমে পাট ও সব্জি বপন/লাগান হয়। এ পদ্ধতিতে ৪০ সে.মি. দূরে দূরে লাইন এবং প্রতি লাইনে ৪০ সে.মি. দূরে দূরে চারা রোপন করা হয়। এজন্য বিভিন্ন ফসলের বীজের হার বিভিন্ন হয়। যেমন শতাংশ প্রতি পাট বীজ ২০ গ্রাম, লালশাক ৫০ গ্রাম, মূলাশাক ১৫ গ্রাম এবং বেগুন/টমেটো চারা ২০০ টি।

- প্রয়োজন মাফিক যে কোন আন্তঃপরিচর্যা যেমনঃ নিড়িদেয়া, মাটি ঝুরঝুরে করে দেয়া, অবাঞ্ছিত/রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমনে ঔষধ প্রয়োগ, সেচ দেয়া, অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করা ইত্যাদি কাজ সময়মত করতে হবে। তবে শাক-সব্জি, পাটের বীজ ফসলের সাথে চাষ করা হয় বিধায় ফসলে ঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং সব্জি ফসল সংগ্রহের পূর্বে কমপক্ষে ৫-৭ দিনের মধ্যে কোন কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত নয়।

- পাট ফসলের শতকরা ৬০-৭০ ভাগ ফল বাদামী রং ধারন করলে গাছের গোড়া সমেত রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকাল বেলা কেটে ক্ষেতে বিছায়ে রেখে বিকেল বেলা সংগ্রহ করতে হয়। পাটের বীজ ফসল সংগ্রহের সময় বীজের প্রায় ৩০-৩৫% জলীয় বাষ্প থাকে যা কাটার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে না পারলে বীজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। পাটের বীজ ফসল কাটার পর কখনো স্তুপ করে, কোন কিছু দিয়ে ঢেকে রাখা যাবেনা, তাতে গরমে বীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রতিদিন ৮ ঘন্টা হিসেবে কমপক্ষে ৫ দিন গাছ থেকে বীজ ছড়ানোর পর রৌদ্রে শুকাতে হবে। ধান শুকানোর মত পাটের বীজ (২/১ টি) মুখে নিয়ে দাত দিয়ে চিবালে কট করে শব্দ হলে বুঝতে হবে তা ভালভাবে শুকিয়েছে। এমন অবস্থায় বীজ সম আয়তনের প্লষ্টিক বা টিনের পাত্রে ভালভাবে মুখ এটে বীজ সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষণের সময় প্রতি কেজি পাট বীজে ৪ গ্রাম প্রোভেক্স ২০০ মিশিয়ে সংরক্ষণ করতে পারলে বীজ দীর্ঘদিন ভাল থাকে এবং পরে বপন মৌসুমে উত্তম বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

প্রযুক্তি হতে প্রাপ্ত ফলনঃ

- শীতকালিন শাক-সব্জির সাথে নাবী পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি পাট বীজ ১৭৫-২০০ কেজি, বেগুন- ১০ টন, টমেটো ১০ টন, লালশাক ৪ টন এবং মূলা ৪ টন উৎপাদন করা যায়।

- এককভাবে পাট বীজ ফসল চাষ করলে যে লাভ হয় তার তুলনায় শীতকালিন শাক-সব্জির সাথে পাট বীজ উৎপাদন করলে ২.০-২.৫০ গুন বেশী লাভ হয়। এ প্রযুক্তি পরিবেশ বান্ধব ও দুষণ মুক্ত।

কৃষি বনায়ন পরিবেশে নাবী পাট ও পাট জাতীয় বীজ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি

কৃষি বনায়ন একটি টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এটি মাঠ ফসল, উদ্যান ফসল, বন এবং প্রাণী সম্পদ সমন্বয়ে কার্যকর এবং জনপ্রিয় একটি উন্নয়ন কার্যক্রম। এ পদ্ধতিতে বসত বাড়িতে, ফল বাগানে, ফসলের মাঠের চারিদিকে এবং পতিত জমিতে গাছের চারা রোপন করে এর বাড়তি আয় দিয়ে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান যেমন বাড়ানো যায়, তেমনি আবার বনায়ন সৃজনের মাধ্যমে কৃষি পরিবেশ সংরক্ষন ও সুরক্ষা সহজ হয়। বিজেআরআই উদ্ভাবিত নাবী পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি কৃষকের মাঝে কিভাবে তাদের বসত বাড়িতে, ফল বাগানে, ফসলের মাঠের চারিদিকে এবং পতিত জমিতে কৃষি বনায়ন পরিবেশে গাছের চারা আবাদ/রোপন করে বাড়তি আয় এবং পাট বীজ উৎপাদন স্বনির্ভর হওয়া যায় তার ব্যবস্থা করাই এ প্রযুক্তির উদ্দেশ্য।

বাস্তবায়ন কৌশলঃ নাবী পাট বীজ উৎপাদন পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য আমরা বসত বাড়ি, ফল বাগান, ফসলের মাঠের চারিদিক এবং পতিত জমিকে নির্বাচন করতে পারি। সব পর্যায়ের চাষীরা এ প্রযুক্তি বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধ হবেন, কেননা এই সব জায়গা গুলো সাধারণত: তারা চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করেন না।

নাবী পাট ও পাট জাতীয় বীজ উৎপাদন পদ্ধতিঃ কৃষি বনায়ন পরিবেশে পাট বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে। এভাবে বেশী করে পাট বীজের চাষাবাদ করলে দেশীয় পাট বীজের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হবে। এজন্য যেসব পদ্ধতি বা নিয়ম পালন করতে হয় তা বিস্তারিত ভাবে এবং পর্যায়ক্রমে নিচে বর্ণনা করা হলঃ

চিত্রঃ কৃষি বনায়ন পরিবেশে পাট বীজ উৎপদান

ক) জমি নির্বাচনঃ সাধারণতঃ আমরা আঁশ ফসলের জন্য যে পাট চাষ করি তার জন্য জমি তৈরী করি বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে কিন্তু কৃষি বনায়নের মাধ্যমে নাবী পাট বীজ উৎপাদন করার জন্য জমি তৈরী ও বপন করতে শ্রাবন-ভাদ্র মাসে। সাধারণ কৃষি জমি না নিয়ে আমরা পতিত জমি, বাড়ীর আঙিনা, ফল বাগান, পুকুর পাড় ইত্যাদি জায়গাকে বীজ উৎপাদনের জন্য নির্বাচন করতে পারি।

খ) জমি তৈরীঃ কৃষি বনায়ন পরিবেশে নাবী পাট বীজ উৎপাদন করার জন্য আলাদাভাবে জমির পরিচর্যার খুব বেশী প্রয়োজন হয় না। অপ্রয়োজনীয় গাছ, লম্বা ঘাস, আবর্জনা সরিয়ে আচড়ার সাহায্যে হালকা নিড়ানী দিলেই জমি তৈরী হয়ে যায়।

গ) বীজ বপনের সময়ঃ পাটের বীজ শ্রাবণ মাসের প্রথম পক্ষ (মধ্য জুলাই) থেকে ভাদ্রের ১৫ (আগষ্টের শেষ) তারিখ পর্যন্ত বপন করা চলে। তবে, দেশী পাট বীজ শ্রাবন (মধ্য জুলাই-মধ্য আগস্ট) মাসের মধ্যে এবং তোষা পাটের বীজ ১৫ ভাদ্রের (৩০ শে আগষ্ট) মধ্যে বপন করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়। দেশের অঞ্চল বিশেষে বপন সময়ের পার্থক্য ঘটে, যেমন উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে (দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী ও

বগুড়া) ১৫ দিন আগে বীজ বপন করতে হবে কেননা শীত ঐ অঞ্চলে আগে আসে। পক্ষান্তরে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যথা যশোর, কুষ্টিয়া অঞ্চলে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।

ঘ) বীজের হারঃ সারিতে বপন করলে প্রতি হেক্টরে ৪ কেজি অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ১৬ গ্রাম তোষা বীজ এবং প্রতি হেক্টরে ৫ কেজি অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ২০ গ্রাম দেশী বীজ বপন করতে হবে। ছিটিয়ে বপন করলে প্রতি হেক্টরে ৫ কেজি অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ২০ গ্রাম তোষা বীজ এবং প্রতি হেক্টরে ৬ কেজি অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ২৪ গ্রাম দেশী বীজ বপন করতে হবে।

ঙ) সার প্রয়োগঃ জমির শেষ চাষের সময় প্রতি হেক্টরে ৩৬ কেজি ইউরিয়া (শতাংশে ১৪৬ গ্রাম), ৭৫ কেজি টিএসপি (শতাংশে ৩০৪ গ্রাম) এবং ২০ কেজি এমপি (শতাংশে ৮০ গ্রাম) সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ১৫/২০ দিন পর (দ্বিতীয় কিস্তিতে), ৩৬ কেজি ইউরিয়া (শতাংশে ১৪৬ গ্রাম) উপরি প্রয়োগ করতে হবে। দ্বিতীয় কিস্তির সার প্রয়োগের ১৫ দিন পর (তৃতীয় কিস্তিতে) আরো ৩৬ কেজি ইউরিয়া (শতাংশে ১৪৬ গ্রাম) উপরি প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে জিপসার ও জিংকের অভাব থাকলে প্রতি হেক্টরে ১০০ কেজি জিপসাম (শতাংশে ৪০৪ গ্রাম) এবং ৫ কেজি জিংক অক্সাইড (শতাংশে ২০ গ্রাম) প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বপনের দিন শেষ চাষের সময় প্রয়োগকৃত সার ভাল করে মাটির সংগে মিশিয়ে দিতে হবে। উপরি প্রয়োগ হিসেবে শুধুমাত্র ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করার সময় গাছের কচি পাতা বা ডগায় না লাগে। উপরি প্রয়োগের সার শুকনা ঝুরঝুরা মাটি অথবা ছাইয়ের সংগে মিশিয়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

চ) আন্তঃ পরিচর্য়াঃ (১) মাঝে মাঝে আঁচড়া বা নিড়ি দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমির মাটি বসে না যায় অর্থাৎ জমাট বেঁধে না যায়। মাটি জমাট বেঁধে গেলে নিড়ি দিয়ে ঝুরঝুরে করে দিতে হবে। জমির উপরিভাগের মাটি ঝুরঝুরে করে দিলে মাটিতে দীর্ঘ দিন রস জমা থাকে এবং ফসল কাটা পর্যন্ত মাটিতে রসের অভাব হয় না। (২) দ্বিতীয় কিস্তির সার প্রয়োগের ২/১ দিন পূর্বে নিড়ি দিয়ে জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। (৩) শেষ বা তৃতীয় কিস্তির সার প্রয়োগের পূর্বে আর এক দফা নিড়ি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। যেহেতু আমরা জমি হিসেবে বাড়ীর আঙ্গিনা, ফলবাগান,পতিত জমি ও পুকুর পাড় নির্বাচন করি, সেহেতু আশ-পাশের গাছের ডাল-পালা যথাসম্ভব ছেঁটে দিয়ে জমিতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে।

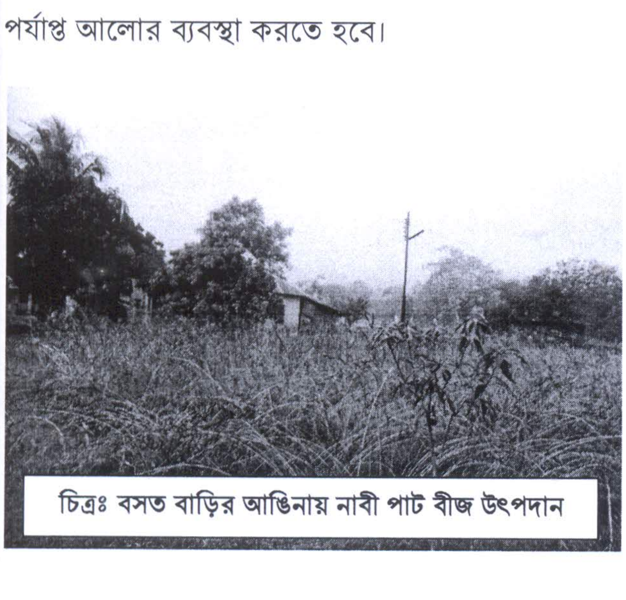

চিত্রঃ বসত বাড়ির আঙিনায় নাবী পাট বীজ উৎপদান

ছ) রোগ ও পোকামাকড় দমনঃ গাছে রোগ দেখা দিলে ডাইথেন এম-৪৫, পাঁচ লিটার পানির সাথে ১০ গ্রাম মিশিয়ে প্রতি শতাংশ জমিতে দুইদিন পর পর অন্তত ২ বার ছিটিয়ে দিতে হবে। মাঝে মাঝে মাঠ পরিদর্শন করে রোগাক্রান্ত গাছ, পাতায় হলদে ছিটে পড়া গাছ বা মরা গাছ টান দিয়ে শিকড়সহ উঠিয়ে আগুনে পুড়িয়ে বা বেশ দুরে কোথাও মাটিতে পুতে ফেলতে হবে। ফল হওয়ার পর কোন গাছ রোগাক্রান্ত দেখা গেলে সে গাছের বীজ কোন

মতেই সংগ্রহ করা উচিৎ নয়। নাবী পাট বীজ ফসলে সাধারণতঃ হলদে মাকড় ও চেলে পোকার আক্রমন হয়ে থাকে। হলদে মাকড়ের আক্রমনের শুরুতে নিম পাতার নির্যাস (১ ভাগ কাচা নিম পাতা ১০ ভাগ গরম পানিতে কিছুক্ষণ রেখ ছেকে ঠান্ডা করে নিলে নির্যাস পাওয়া যাবে) স্প্রে করলে এবং চেলে পোকার আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় ডগা আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। সুস্থ্য ও নীরোগ বীজ বপন করলে এবং জমি পরিষ্কার রাখলে জমিতে রোগবালাই কম হবে। পোকামাকড় ও রোগের আক্রমন ব্যাপক আকারে দেখা দিলে স্থানীয় শস্য সংরক্ষণ কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে উপযুক্ত ঔষধ ছিটানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

জ) বীজের অংকুরোদগম পরীক্ষাঃ যে কোন পাট জাতের বীজ বপন করার আগে বীজের ভালোমন্দ বিশেষতঃ অংকুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে নেয়া ভাল। খুব সহজে এবং অল্প খরচে এ কাজ করা যায়। প্রথমে বীজের পাত্র থেকে ১০০ টি বীজ গুনে নিন। এবার একটি মাটির সানকিতে এক পরতা ভেড়া কাপড় বা চোষ কাগজ (ব্লটিং পেপার) বা তা না থাকলে খবরের কাগজ ২-৩ পরতা বিছিয়ে পানি দিয়ে ভাল করে ভিজিয়ে নিয়ে তার উপর ঐ ১০০ টি বীজ সুন্দর করে ছড়িয়ে দিতে হবে। সানকির তলায় যে জায়গা থাকে তাই ১০০ টি বীজ ছড়ানোর জন্য যথেষ্ট, পাশে ছড়াতে হয় না। এবার আর একটি সানকি বা সরা দিয়ে ঐ বীজপূর্ণ সানকি ঢেকে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সানকির কাপড় বা কাগজ শুকিয়ে না যায় অথবা বীজ পানিতে ডুবে না যায়। সে জন্য দিনে একবার দেখে শুকিয়ে থাকলে দরকার মত পানি ছিটিয়ে দিতে হবে। বীজ বসানোর তিন দিন পর মোট যে কটি বীজ গজানো দেখা যাবে সেটাই হলো বীজ গজানোর শতকরা হার। শতকরা আশিটির অধিক বীজ গজালে তাকে ভাল বীজ বলা যেতে পারে। যদি শতকরা ৭০ টির অধিক কিন্তু ৮০ টির কম বীজ গজায় তাহলে বীজ বপনের সময় বীজের পরিমাণ বাড়িয়ে নিয়ে বপন করতে হবে। শতকরা ৭০ টির কম বীজ গজালে ঐ বীজ বপন না করাই ভাল।

চিত্রঃবনায়ন পরিবেশে উৎসাহীরংপুরের পাট বীজ চাষীবৃন্দ

ঝ) ফলনঃ জাত ও জমি ভেদে এ পদ্ধতিতে তোষা পাটের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একরে ২০০ থেকে ৩০০ কেজি (শতাংশে ২ থেকে ৩ কেজি) উন্নতমানের বীজ পাওয়া যায়। এভাবে প্রতি শতাংশে উৎপাদিত বীজ দিয়ে ১ একর পাট আঁশ ফসলের চাষ করা যায়।